নারীবাদ

দার্শনিক ভিত্তি

ড. আব্দেল ওয়াহাব আলমাসিরী
প্রফেসর ড. হাসান শাফিয়ী
ড. হাইফা জাওয়াদ
উস্তায হাসান স্পাইকার

অনুবাদক

মুহাম্মাদ শাকিল হোসাইন

রাইয়ান প্রকাশন

অনুবাদকের ভূমিকা

মানবজাতির সূচনালগ্ন থেকেই নারী ও পুরুষরা ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক দায়িত্ব পালন করে আসছে। এই পার্থক্য নারী বা পুরুষ যেকোনো একটি লিঙ্গের অন্তর্নিহিত শ্রেষ্ঠত্ব বা উৎকর্ষতার কারণে না; বরং প্রকৃতিই তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন গঠনে গঠিত করেছে—এই কারণে। প্রাকৃতিক এই ভিন্নতার কারণে স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ভিন্ন হয়েছে, যেহেতু নারী ও পুরুষের শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতা-সামর্থ্য, সহজাত প্রবণতা ইত্যাদি একে অপরের চাইতে বেশ খানিকটা ভিন্ন। হ্যাঁ, তাদের মধ্যে মিলও আছে অনেকখানি, তবে ভিন্নতাও নেহায়েত কম না, সেই তালিকাও দীর্ঘ বটে।

কিন্তু ইতিহাসের একটি পর্যায়ে পাশ্চাত্য থেকে উঠে আসা নারীবাদ প্রথমদিকে নারীমুক্তি আন্দোলন হিসেবে শুরু করলেও তা রীতিমতো হয়ে ওঠে নারীর স্বাতন্ত্র্য, স্বকীয়তা ও পরিচয়কে একেবারে ঢেলে সাজানোর নব-বিপ্লব হিসেবে। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে, তা নারীর স্বকীয়তা, স্বভাব-প্রকৃতিকে সহস্র বছরের অভিজ্ঞতা, যুক্তির বিপরীত স্রোতে দাঁড় করায়।

ফলে আমরা পাই এমন নারীসত্তাকে যা আদতে তার পরিপূরক অর্থাৎ পুরুষের চাইতে আগাগোড়া ভিন্ন। যেন তাদের মধ্যে কোনো মিল, সাদৃশ্য বলতে কিছুই নেই। যা আছে তা বিশুদ্ধ পৃথকতা। যেন তারা পানি আর তেলের মত। একটা আরেকটার সাথে কস্মিনকালেও মেলে না। যেন তারা দুটি ভিনগ্রহের বাসিন্দা। একজন আরেকজনের কাছে বিলকুল আজনবি।

যেই নারীর জন্য মাতৃত্ব, স্ত্রীত্ব বলতে কিছু নেই। বরং সে প্রকাণ্ড পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক যন্ত্রের একটা নগণ্য দাঁতমাত্র। তার কাছে নিজের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, নিজের ক্যারিয়ার, চাকরি-বাকরি সর্বাগ্রে। অন্যসব কিছু আসে তার পরে। তার অধীন হয়ে। যেই নারী নিজেকে মেলে ধরতে চায়। সে নিরন্তর বিদ্রোহ করে সমাজের বিরুদ্ধে, সমাজের নীতি-নৈতিকতার বিরুদ্ধে। এই সমাজ তার কাছে পুরুষশাসিত, পিতৃতান্ত্রিক। যার গোড়াপত্তন-ই হয়েছে নারীদেরকে দাসী, অধীনস্থ

বানিয়ে রাখার জন্যে। এবার বিদ্রোহ করে সেই সমাজ থেকে বেরিয়ে এসে নারীকে নিজের ইতিহাস, ভাষা, সংস্কৃতি, সমাজ, নীতি-নৈতিকতা, আইন সবকিছুকেই নতুনভাবে দেখতে হবে, সাজাতে হবে, বিন্যস্ত করতে হবে। তাহলেই মিলবে নারীজাতের মুক্তি। পরম মোক্ষ।

কিন্তু পৃথিবীর কোনো মতাদর্শই হাওয়ায় ভেসে আসে না। এর পেছনে থাকে কিছু প্রত্যয়, কিছু অনুমান, কিছু বিশ্বাস। কীসের ব্যাপারে বিশ্বাস? মহাবিশ্বের ব্যাপারে, মানুষের ব্যাপারে, মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির ব্যাপারে, মানুষের পরমার্থের ব্যাপারে, মানুষের একে অপরের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে। মহাবিশ্ব ও এর মধ্যে বসবাসকারী মানুষ আর এই মহাবিশ্বে তার অবস্থান ও এর সাথে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি—বলা যায় এটাই হচ্ছে সমস্ত দর্শনের সারাসার। কারণ সকলেই এসব বিষয় থেকে শুরু করে। আর নাহয় কারও শুরু করে দেওয়া মতের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে অন্যান্য বিষয়ে প্রবেশ করে।

এসব বিষয়ে ভিন্ন মত, ভিন্ন উত্তর—জীবন ও জগতের বড় বড় সামাজিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নানা সিদ্ধান্তের ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি, প্রত্যক্ষণ আমূল পরিবর্তন করে দিতে পারে। তাই মানুষ মানুষের ব্যাপারে কি ভাবছে না ভাবছে তা মোটেও ফেলনা না; অতীব গুরুত্বপূর্ণ, একেবারেই বুনিয়াদি। এই বুনিয়াদ দৃঢ় হলে তার ওপর গড়ে তোলা মতাদর্শের ইমারতও হবে মজবুত। অন্যথায় এর ভাঙন বিধির লিখনের মতই অবশ্যম্ভাবী।

নারীবাদও একটা মতাদর্শ। যার শুরুটাও হয়েছিল ওই মৌলিক স্থানের বিচ্যুতি থেকেই। তাদের মূল সমস্যা নারী ও নারীত্বের বোধ থেকেই। তারা নারীত্বকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে, মানুষের ব্যাপারে যে ধারণা থেকে করেছে—সেটাই তাদেরকে আজকের এই স্থানে পৌঁছে দিয়েছে। হ্যাঁ, পরবর্তী সময়ে সংযোজন বিয়োজন অনেক ঘটেছে, সবই ওই মৌলনীতির আলোকে, তাকে বাদ দিয়ে না। তার স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে, বিচ্ছিন্ন হয়ে না।

দার্শনিক এই ভ্রান্তি, বিচ্যুতিই তাদের সামাজিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নানা হাস্যকর ও অবাস্তবিক অবস্থানের জন্য দায়ী। দার্শনিক বক্রতার প্রভাব পড়েছে অন্য সকল ক্ষেত্রে। দার্শনিক বিষবাষ্পের উগ্রতা গোটা মতাদর্শিক পরিমণ্ডলকে করে তুলেছে শ্বাসরুদ্ধকর।

এ কারণে যেকোনো মতবাদকে গভীর থেকে বুঝতে চাইলে দরকার এর দার্শনিক অবস্থান, শক্তিমত্তা ও দুর্বলতাকে বোঝা। তাহলেই সম্ভব এর সাথে যথার্থ বোঝাপড়া করা। অন্যথায় শাখা-প্রশাখায় কাঁচি চালিয়ে খুব অল্পই লাভ হয়।

অত্র সংকলনধর্মী বইটির লক্ষ্যও এটাই। যেই ধ্বংসাত্মক অবস্থানে এসে নারীবাদ আজকে এসে পৌঁছেছে—তার মূল কারণ দার্শনিক অবনতি, বিচ্যুতি, বিপর্যয়। এবার নারীবাদের দার্শনিক অবস্থানকে বিবেচনার সময় এসেছে। সময় এসেছে গ্রন্থি উন্মোচনের। কি আছে নারীবাদের ঝুলির ভেতরে তা দেখার। তার হৃৎস্পন্দনের একেবারে মর্মমূলে পৌঁছে যাওয়ার। আশা করি বইটি এই যাত্রায় সাহায্য করবে। বিশেষত ড. আব্দেল ওয়াহাব আলমাসিরীর প্রবন্ধটি হতে পারে চক্ষু-উন্মোচনকারী। আমি যখন প্রবন্ধটি পড়েছিলাম, সম্ভবত বছর তিনেক আগে, মনে হয়েছিল পাশ্চাত্যের কয়েকশ বছরের ইতিহাস যেন তার লেখায় আত্মা ধারণ করে একেবারে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আশা করছি পাঠকরাও একই অনুভূতি পাবেন।

আল্লাহর কাছে দুআ রইল, তিনি যেন এই তুচ্ছ প্রচেষ্টাটুকু কবুল করে নেন ও পাঠকদেরকে এই বই থেকে উপকৃত করেন এবং তা সংকলকের নাজাতের উসিলা হয়ে দাঁড়ায়—যেদিন সবচেয়ে প্রিয়জনও প্রিয়জনের কাছ থেকে দূরে সরে যাবে, সবার মুখে থাকবে একটাই কথা: নাফসি! নাফসি! আমীন।

মুহাম্মাদ শাকিল হোসাইন

সূচিপত্র

নারীবাদ—নারীমুক্তি নাকি নারীত্ব তথা মানবতার ধ্বংস? ১০

হারমেনিউটিক্স ও ইসলামের নারীবাদী ব্যাখ্যা.....৫৭

ইসলামি নারীবাদের ভ্রান্তি.....৭৬

লিঙ্গরুপান্তরবাদ ও আমাদের স্বর্গীয় প্রকৃতির লঙ্ঘন..... ৮৪

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ড. আব্দেল ওয়াহাব আলমাসিরী ১৯৩৮ সালে মিসরের দামানহুরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৯ সালে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক করে চলে যান আমেরিকায়। রুটগার্জ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্য ও তুলনামূলক সাহিত্যের ওপর পিএইচডি হাসিল করেন। ছিলেন আধুনিক বিশ্বের অন্যতম মুসলিম চিন্তাবিদ।

নারীবাদ–নারীমুক্তি নাকি নারীত্ব তথা মানবজাতির ধ্বংস?

মানবজাতির ইতিহাসের শুরু থেকেই মানুষ চেষ্টা করে আসছে নিজেকে, নিজের অস্তিত্বকে, আর তার ভেতরে নিহিত সম্ভাবনাকে জানার ও বোঝার। কে আমি? মানুষ আসলে কী?—এই প্রশ্নগুলো যুগে যুগে মানুষের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী, রাজনীতিক, বৈজ্ঞানিক কিংবা ধর্মীয় পণ্ডিত—প্রত্যেকেই এ বিষয়ে কিছু না কিছু বলার চেষ্টা করেছেন। কখনো তারা একমত হয়েছেন, আবার কখনো করেছেন তীব্র মতবিরোধ। তবুও, নিরন্তর অনুসন্ধান, অগণিত তর্ক-বিশ্লেষণে ভরা মানুষের স্বরূপ অনুধাবনের এই দীর্ঘ যাত্রা এটাই প্রমাণ করে, মানুষ নিজ জাতির প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণ করে। একই সাথে, এটি তার ভেতরে লুকিয়ে থাকা এক দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষার দিকে ইঙ্গিত দেয়—নিজের সীমিত সত্তা থেকে মহাসত্তার দিকে উত্তরণের, জাগতিক সীমানা ছাড়িয়ে এক মহাজাগতিক সত্যকে ছুঁয়ে দেখার।

নিঃসন্দেহে সেই ক্ষমতা মানুষের আছে, সেই জ্ঞান-গুণও তার মাঝে আছে—যার দ্বারা সে তুচ্ছ শরীরধারী প্রাণী থেকে ঊর্ধ্বতন, মহত্তর সত্তায় রূপান্তরিত হতে পারে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে এই যাত্রা "কীভাবে" সম্ভব? কীভাবে হবে এই কর্ম সম্পাদন? কীভাবে মানুষ পঞ্চভূতের এই শরীরি অস্তিত্ব ও পাশবিক প্রবৃত্তির নাগপাশ অতিক্রম করে এক পরিপূর্ণ, উন্নততর মানবিক সত্তার উচ্চতায় পৌঁছাতে পারে? কেউ হয়তো বলবে, এই 'পরিপূর্ণতা'র ধারণা আসলে একধরনের অহংবোধ থেকে জন্ম নেয়, যা সত্যিকারের আলোকায়নের পথে অন্তরায়।

কিন্তু আরেকভাবে ভাবলে দেখা যায়—এই পূর্ণতার ধারণা আমাদের অন্তর্নিহিত স্বজ্ঞা (intuition) কিংবা উত্তম থেকে উত্তমতর হয়ে ওঠার সহজাত বাসনা থেকে উৎসারিত। এই তাড়নাই আমাদের বারবার টেনে নেয় সত্য, কল্যাণ, সৌন্দর্য এবং উৎকর্ষের দিকে। মানুষ যেন নিজের ভেতরে থাকা কোনো অদেখা নিদর্শন অনুসরণ করেই এগিয়ে চলে—একটা পরিপূর্ণ রূপের দিকে, যা তার স্বাভাবিক প্রবণতা। যাকে বুঝতে হলে দার্শনিক অনুসন্ধান ও আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন।

মানুষের ভেতরে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠার, নিজেকে পরিবর্তন করার এবং উত্তরণ ও পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার যে প্রবণতা—তার সবচেয়ে চমৎকার বহিঃপ্রকাশ হলো ইতিহাস জুড়ে বারবার জেগে ওঠা নানা আন্দোলন। এই আন্দোলনগুলো কখনো ব্যক্তিগত আত্মজিজ্ঞাসা থেকে, কখনো-বা সমষ্টিগত বোধ থেকে জন্ম নিয়েছে। তারা মানুষের পরিচয়কে নতুন করে সংজ্ঞায়িত ও ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে—মানুষ আসলে কে, তার জীবনের মানে কী, কোথায় তার চূড়ান্ত গন্তব্য এবং সে কোন দিকে এগোবে। এসব প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে তারা গড়ে তুলেছে নানা মতাদর্শ, যার মধ্যে মানুষ নিজেকে খুঁজে পেয়েছে এবং জীবনের জন্য এক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা দিকনির্দেশনা খুঁজে নিতে পেরেছে।

রাজনৈতিক পরিসরে আমরা সাম্যবাদ, সমাজবাদ, উদারনৈতিকতাবাদ ও রক্ষণশীলতাবাদের মতো নানা মতাদর্শের উত্থান ও পতন প্রত্যক্ষ করেছি। একইভাবে, অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের জগতে বহু দর্শন ও চিন্তাধারার আগমন ঘটেছে, তাদের কেউ কেউ একসময় শক্ত প্রভাব ফেললেও সময়ের প্রবাহে অনেকটাই নিঃশেষ হয়ে গেছে। তবে এসব মতাদর্শ ও তত্ত্বের ভিড়ে এমন একটি আদর্শ আছে, যা আমাদের দৃষ্টিতে প্রকৃতির সহজাত নিয়ম ও স্রষ্টা-নির্ধারিত প্রাকৃতিক বিধানের বিরুদ্ধে সবচেয়ে ভয়ানক চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়। আমরা এই আদর্শকে চিনি 'নারীবাদ' নামে।

যুক্তরাষ্ট্রে নারী ভোটাধিকার আন্দোলনেরই একটি শাখা হিসেবে নারীবাদের উত্থান। এর সমর্থকরা দাবি করত ভোটাধিকার কিন্তু ৫০ এর দশকে নারীবাদী আন্দোলন শুরু হওয়ার দু'দশক আগেই নারীরা ভোটাধিকার পেয়ে গিয়েছিল, এবং এর পাশাপাশি শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে নারীর সমান বেতন-মজুরীর অধিকার। যার কারণে প্রাথমিকভাবে অনেকেই একে নারীমুক্তির ইতিবাচক আন্দোলন হিসেবে দেখতে শুরু করে।

কিন্তু খুব বেশি সময় না যেতেই, বিশেষ করে ১৯৭০ ও ৮০-এর দশক থেকে, থলের বিড়াল বেরিয়ে আসে। নারীবাদী আন্দোলনের প্রকৃত রূপ প্রকাশ পেতে শুরু করে। তখন তা নিছক নারীমুক্তি আন্দোলন হয়ে থাকেনি বরং তা হয়ে উঠেছিলো **প্রথাগত নারীত্বের ধারণাকে ভেঙে ফেলার এবং নারীকে পুরুষের আদলে গড়ে তোলার একটি মতবাদ**। পুরুষকে উপস্থাপন করা হয় নারীর উন্নয়ন ও স্বাধীনতার পথে সবচেয়ে বড় কাঁটা হিসেবে।

কোনো প্রকার বিচার-বিবেচনা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়া, নির্বিচারে, একেবারে নিষ্ক্রিয়তার সাথে পশ্চিমা ধারণা ও পরিভাষাসমূহ গ্রহণ করে নেওয়া বর্তমান মুসলিম ও তৃতীয় বিশ্বের এক দুর্ভাগ্যজনক এক সত্যে পরিণত হয়েছে। তারা উপলব্ধি করতে পারে না যে—এ সকল ধারণা ও পরিভাষাসমূহ স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিমা জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ ও প্রবণতা থেকে এসেছে আর তাই এসব ধারণায় পশ্চিমা ছায়া থাকবে—এটাই স্বাভাবিক। যার কারণে পশ্চিমা ধারণা ও পরিভাষাসমূহকে সমালোচনামূলক দৃষ্টিতে অধ্যয়নের প্রবণতা মুসলিম বিশ্বে অত্যন্ত বিরল।

এসব ধারণার ভেতরে লুকিয়ে থাকা মূল্যবোধ, চিন্তাগত পক্ষপাত (bias) কিংবা মতাদর্শগত উদ্দেশ্যকে উদঘাটন করার কোনো চেষ্টা আমাদের মাঝে দেখতে পাওয়া যায় না। বিশ্লেষণ, প্রশ্ন কিংবা পুনর্বিন্যাসের পরিবর্তে, আমরা সেগুলোকে ঠিক যেভাবে এসেছে সেভাবেই গ্রহণ করে উপস্থাপন করি—একটি পরিপূর্ণ নিজস্ব জ্ঞানচর্চার অভাব থেকেই। অথচ প্রয়োজন ছিল, এসব ধারণা ও ভাষার ভেতরে সুপ্তভাবে প্রোথিত দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধকে উন্মোচন করা এবং আমাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক বাস্তবতা ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে সেগুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ করা। সেই আত্মপ্রতিষ্ঠার শক্তি আমাদের মধ্যে অনুপস্থিত বলেই পশ্চিমা জ্ঞান-প্রভুত্বের ছায়া আজও আমাদের ওপর ভারী হয়ে আছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—পশ্চিমা সাহিত্যে "মানুষ" নামক সত্তাটি কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, সে প্রশ্ন আমরা খুব কমই করি। তাকে কি নিছক একটি ভৌতিক, শরীরনির্ভর জীব হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে? নাকি তাকে বোঝানো হয়েছে এক জটিল সত্তা হিসেবে, যার ভেতরে রয়েছে বহুস্তরীয় উপাদান—যা শুধুই শরীর নয় বরং এমন কিছু যা ভৌতিক সীমা অতিক্রমেরও সক্ষমতা রাখে? আমরা সাধারণত প্রশ্ন করিই না, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের উৎস কোথায়? মানুষ কি কেবল বস্তুগত গতি-প্রক্রিয়া থেকেই নীতির ধারণা তৈরি করেছে নাকি তার ভেতরে রয়েছে আরও গভীর, অধিবিদ্যক উৎস? আমরা জিজ্ঞাসা করি না—মানুষের জীবনের কোনো পরম উদ্দেশ্য আছে কি? নাকি সে নিছকই এক দৈব দুর্ঘটনার ফলাফল—যার একমাত্র লক্ষ্য হলো স্বাধীনতার নামে সীমাহীন ভোগের মাধ্যমে জীবনের রঙ-রস শুষে নেওয়া?

এই প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলোর উত্তরই ঠিক করে দেয় মানুষকে আমরা কোথায় অবস্থান করাচ্ছি—মহাবিশ্বের কেন্দ্রস্থলে, এক সত্তা হিসেবে যে জড়জগতকে অতিক্রম করতে পারে? নাকি একেবারে নিচের স্তরে, কেবল প্রাকৃতিক কারণ ও বস্তুগত কার্যকারণের দাস হিসেবে, যার নিয়তি নির্ধারিত বিজ্ঞানের সূত্র ও জড়পদার্থের বিধান দ্বারা? এসব প্রশ্নের নিরুত্তর অবস্থান থেকেই বহু ভুল মতাদর্শ জন্ম নিয়েছে—যেখানে মানুষকে হয় ঈশ্বরের মর্যাদায় বসানো হয়েছে নয়তো নিছক জড় বস্তু হিসেবে খাটো করা হয়েছে।

আমরা যে সকল পশ্চিমা ধারণার হাত বদল করে থাকি সে সকল ধারণার রন্ধ্রে রন্ধ্রে লুকিয়ে থাকা মানবীয় অস্তিত্বের চূড়ান্ত ও পরম প্রশ্নসমূহের ব্যাপারে নির্দিষ্ট প্রবণতা, ঝোঁক, বিশ্বদৃষ্টিকে উন্মোচন এবং তার যথার্থ বিশ্লেষণ করতে আমরা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছি। আর এটাই মুসলিম বিশ্বের জ্ঞানগত অধীনস্থতার মূল কারণ। এরূপ অধীনতাকে-ই আমাদের জাতীয় বুদ্ধিবৃত্তিকতার প্রধান চরিত্র বলা চলে।

"ফেমিনিজম" পরিভাষাটি অধুনা পশ্চিমা সাংস্কৃতিক ভাবাদর্শের অন্যতম কেন্দ্রীয় একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর আরবি করা হয়ে থাকে "নিসায়িয়্যাহ" কিংবা "উনছাবিয়্যাহ" হিসেবে, আর বাংলায় একে "নারীবাদ" বলে অনুবাদ করা হয়। তবে ইংরেজি পরিভাষাটির পরিপূর্ণ প্রতিফলন আরবি প্রতিশব্দটিতে নেই। এ আরবি পরিভাষাটির সবচেয়ে ভালো অনুবাদ হবে "নারীত্ব" বা এ জাতীয় শব্দ। অর্থাৎ, এর মাধ্যমে ইংরেজি পরিভাষাটির অভ্যন্তরে সুপ্ত প্রচ্ছন্ন ধারণাগুলো ঠিকঠাক উঠে আসে না। "ফেমিনিজম" পরিভাষাটির প্রকৃত অর্থোদ্ধারের জন্য একে সামগ্রিকভাবে, সকল দিক থেকে সংজ্ঞায়িত করা দরকার। এর জন্য দরকার এই ধারণাটিকে বিস্তৃততর চিন্তা-কাঠামোর, অর্থাৎ "মানবাধিকার" (human rights) নামক ধারণার, মধ্যে স্থাপন করা। কেননা নারীমুক্তি মানবাধিকার ধারণা থেকে উৎসারিত।

মানুষ ও প্রাকৃতিক মানুষ

শেষের কথাটি ব্যাখ্যা করার আগে বলে রাখতে হয় যে—অত্র লেখকের আলোচনার মূলে আছে একটি মৌলিক জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রত্যয়, যা মানবজাতি ও

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

প্রফেসর ড. হাসান শাফিয়ী একজন খ্যাতনামা ইসলামী চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ। তিনি ১৯৬৩ সালে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের দারুল উলুম অনুষদ থেকে আরবি ভাষা ও ইসলামিক সায়েন্সে স্নাতক সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৯ সালে ইসলামিক দর্শনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং ১৯৭৭ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামিক দর্শনে পিএইচডি অর্জন করেন। বর্তমান সময়ের অন্যতম চিন্তার ময়দানে অন্যতম প্রাজ্ঞ আলিমদের একজন। ২০২২ সালে লাভ করেন মুসলিম বিশ্বের নোবেল পুরষ্কার হিসেবে খ্যাত বাদশা ফয়সাল পুরষ্কার।

হারমেনিউটিক্স ও ইসলামের নারীবাদী ব্যাখ্যা

শায়খ ড. হাসান শাফিয়ী

এই প্রবন্ধে আমরা বিশ্লেষণ করব একটি বিশেষ বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ব্যাপারে, যা সাম্প্রতিক সময়ে ইসলামি বিশ্বে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে। এর অনুসারীরা নসের (অর্থাৎ, কুরআন ও হাদিসের) ব্যাখ্যায় মুসলিম ঐতিহ্যকে একেবারে অগ্রাহ্য করে, এবং তার পরিবর্তে পাশ্চাত্যের তৈরি হারমেনিউটিক্স (ব্যাখ্যাতত্ত্ব) প্রয়োগ করতে চায়।

তারা ইসলামি শাস্ত্র ব্যাখ্যার ঐতিহ্যগত পদ্ধতি, শতাব্দী ধরে তিল তিল করে গড়ে ওঠা উসূল (নীতিমালা), এবং ইসলামের ইতিহাস ও সভ্যতার অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করে। তাদের মনে পূর্ব থেকেই একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, মুসলিমদের পুরো বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য—চিন্তাধারা ও সামাজিক কাঠামো উভয়ই—পিতৃতান্ত্রিক ও নারীবিরোধী। এই ধারণার ভিত্তিতে তারা কুরআন-সুন্নাহর এমন এক বিকল্প ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে চায় যা ইসলামি ঐতিহ্য থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন।

এই প্রবণতা মূলত পাশ্চাত্যের কিছু গবেষক ও চিন্তাবিদদের হাত ধরে গড়ে উঠেছে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। এরা পাশ্চাত্য চিন্তা ও সাহিত্য নিয়ে গভীর জ্ঞান রাখে তবে ইসলামি সংস্কৃতি ও শাস্ত্র নিয়ে এদের জ্ঞান খুবই অল্প। এদের একটি বড় অংশ পাশ্চাত্যে বাস করে, আবার অনেকে মুসলিম দেশে থেকেও পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেছে।

যদিও এখনও এই আন্দোলন মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়নি, তবুও বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তারা ক্রমেই সক্রিয় ও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ভবিষ্যতে এই প্রবণতা ইসলামি বিশ্বে প্রভাব ফেলতে পারে। এর ফলে মুসলিমরা হয়তো পুরোপুরি ইসলামি ঐতিহ্যকে পরিত্যাগ করবে না, কিন্তু সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হবে। এই বিভ্রান্তি ইসলামি পুনর্জাগরণ ও বিপ্লবের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

মূল আলোচনায়—ইসলামের নারীবাদী ব্যাখ্যার উৎস বিশ্লেষণ—প্রবেশের পূর্বে একটি বিষয় স্পষ্ট করা জরুরী। আমরা সংস্কৃতিসমূহের আন্তঃযোগাযোগ ও আন্তঃসংলাপের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করি। নিঃসন্দেহে এটা প্রশংসনীয় লক্ষ্য। তাছাড়া বর্তমান বিশ্বায়নের পরিস্থিতিতে এটা অপরিহার্য ও অনিবার্য এক বাস্তবতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা,

১. বিশুদ্ধ সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আরবি-ইসলামি সংস্কৃতির মূল চেতনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইসলাম মানবজাতির একত্ব এবং একটি যৌথ উৎসের ধারণার ব্যাপারে বিশ্বাসী। মানুষের জাতি, গোষ্ঠী বা ভাষাগত পার্থক্যকে ইসলাম সংঘর্ষের কারণ নয়, বরং পারস্পরিক পরিচিতি, বোঝাপড়া এবং সৌহার্দ্যের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে।

২. আমাদের পূর্বসূরিরাও এমন আন্তঃসাংস্কৃতিক যোগাযোগে অংশগ্রহণ করেছেন—কোনো প্রকার বর্ণবাদ, স্থবিরতা কিংবা সংস্কারবদ্ধতা থেকে মুক্ত থেকে। ইসলামি সভ্যতার বিকাশকালীন সময়ে এই ধরনের বিনিময় ও সংলাপ তাদের জন্য একটি শক্তি ও সমৃদ্ধির উৎসে পরিণত হয়েছিলো। তারা কখনো সংকীর্ণতা বা দ্বিধায় ভোগেননি। উদাহরণস্বরূপ, প্রখ্যাত দার্শনিক আবু ইয়াকুব আল-কিন্দি ইসলামি সভ্যতার স্বর্ণযুগে লিখেছেন,

> "যে বা যারা সামান্য পরিমাণে হলেও সত্য নিয়ে আসে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা বাঞ্ছনীয়। আর যে বহুল পরিমাণে সত্য আনে তার ব্যাপারে তো কোনো কথাই থাকতে পারে না। কেননা তারা নিজেদের চিন্তা আমাদের সাথে ভাগ করে নিয়েছে ও জ্ঞানান্বেষণকে সহজ করেছে.....সত্য যেখান থেকেই আসুক না কেন, এমনকি দূরের কোনো অঞ্চল বা ভিন্ন কোনো জাতির কাছ থেকে হলেও, তার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিতে কোনো প্রকার লজ্জাবোধ করা উচিত নয়। তাকে অকপটে গ্রহণ করে নিতে হবে। কেননা সত্যান্বেষীদের জন্য সত্যের চেয়ে বড় আর কিছুই নেই!"

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

উস্তায হাসান স্পাইকার কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে Plotinus, Dionysius the Areopagite, Kant এবং Hegel-এর রচনাসমূহ অধ্যয়ন করেন, যেখানে তিনি দর্শনে এমফিল ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং বর্তমানে ডক্টরাল গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। মধ্যপ্রাচ্যে কয়েক বছর আলিমদের অধীনে ইসলামী জ্ঞানশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন, বিশেষভাবে ইবন আরাবির ধারা ও পরবর্তী কালামশাস্ত্রের ওপর মনোনিবেশ করেন। তাঁর নতুন বই Hierarchy and Freedom: An Examination of Some Classical Metaphysical and Post-Enlightenment Accounts of Human Autonomy ২০২৩ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

লিঙ্গরুপান্তরবাদ ও আমাদের স্বর্গীয় প্রকৃতির লঙ্ঘন

উস্তায হাসান স্পাইকার

"তাঁর নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য থেকে স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাঁদের কাছে গিয়ে শান্তি লাভ করো এবং তিনি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এর ভেতরে নিদর্শন আছে সেসব লোকের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে।"[১]

"এবং পুরুষরা নারীদের মত নয়।"[২]

"মানুষ একই সাথে পাশবিক ও স্বর্গীয় জগতের মিলনক্ষেত্র"—মানুষের ব্যাপারে যত কথা বলা যায় এটাই হলো তার সারাসার; যেমনটা রাগিব ইসপাহানি, গাযালী, শাহ ওয়ালিউল্লাহসহ অন্যান্য প্রবাদপ্রতীম মুসলিম দার্শনিকরা বলেছেন। মানুষের মধ্যে নানা বিপরীতমুখী উপাদানের সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায়। তবে মানুষ হিসেবে মানুষের যে সম্মান বা মর্যাদা সেটা এ কারণে নয়, সেটা নির্ভর করছে এ সকল উপাদানকে যথার্থ ক্রমে সাজানো হয়েছে কিনা এবং সেগুলোকে যথাযথ উপায়ে বিকশিত করা হয়েছে কিনা। মানুষ সৃজনী ভালোবাসার (generative love) দুটি পরিপূরক। অনুপূরক দুটি কর্তা তারা, অর্থাৎ, পুরুষ ও নারী। এর যেকোনো এক প্রকারের কর্তা তাকে হতে হয়; কেননা এই সৃজনী ভালোবাসা অবশ্যম্ভাবীভাবেই দ্বিচালকবিশিষ্ট (binary), এখানে দুইয়ের বেশি হওয়ার কোনো প্রকার সম্ভাবনাই নেই।

সৃষ্টির নিয়মে মানুষ সহজাতভাবেই এই দ্বৈত অধিবিদ্যক নীতির মূর্তপ্রতীক। তাকে হয় পুরুষ আর নাহয় নারী হতে হবে। প্রত্যেক মানুষকে এর যেকোনো একটি করেই পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে। এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। কেউ নারী হবে না পুরুষ—এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই। আমি পুরুষ হব বা নারী

[১] সুরা রুম, আয়াত: ২১
[২] সুরা নিসা, আয়াত: ৩৬

হব—এমনটা মানুষ বলতে পারে না। এর অর্থ দাঁড়ায় পূর্ণাঙ্গ মানুষ হতে গেলে, মানবীয় সেই মর্যাদার অধিকারী হতে গেলে আমাদের সেই নির্দিষ্ট ভূমিকাকে—নারী আর নাহয় পুরুষ—যথার্থতা ও ইহসানের (অনুপুঙ্খ সৌন্দর্যের) সাথে পালন করতে হবে, যে-ই ভূমিকা ঐশ্বরিকভাবে আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে।

মানবীয় মর্যাদার এই অংশটি, অর্থাৎ, লিঙ্গ-দর্শনের ব্যাপারে ইসলামি দর্শনশাস্ত্রের সমৃদ্ধ ও বিস্তৃত ঐতিহ্যে আলোচনা-কথাবার্তা খুব একটা পাওয়া যায় না। বেশিরভাগ দার্শনিকই, অবশ্যই সকলে একযোগে নয়, এ বিষয়টি উপেক্ষা করেছেন। এর সম্ভাব্য কারণ মনে হয় এটাই যে, এ বিষয়টি—অর্থাৎ, মানুষের মাঝে লিঙ্গ কেবল দুটিই, কেউ নারী হবে তো কেউ পুরুষ—এতটাই স্বতঃসিদ্ধ ও প্রাকৃতিক যে, এ ব্যাপারে আলাদা করে কথা বলার কোনো প্রয়োজনই ছিল না, বরং একে বুনিয়াদ ধরে তাঁরা সক্রিয়ভাবে এই সত্যকে ধারণ ও একে পূর্ণতা দান করার কাজেই অধিকতর মনোযোগী ছিলেন।

কিন্তু এখনকার সময় ভিন্ন। এই যুগে মানুষের লিঙ্গধারণার অধিবিদ্যক (metaphysical) ও পরাতাত্ত্বিক (ontological) অবস্থান স্পষ্টভাষায়, পরিষ্কার করে বর্ণনা করাটা আশু দরকার হয়ে পড়েছে। এই আধুনিক যুগের একান্ত প্রয়োজন এটা। কেননা **লিঙ্গের ধারণার ওপর কোনো প্রকার আক্রমণ স্বয়ং মানবস্বভাব ও মানবীয় মর্যাদার ওপর আক্রমণ, যে-ই আক্রমণ বর্তমানে স্বাধীনতা ও আত্মনির্ধারণের নামে অহরহ করা হচ্ছে**। যার কারণে আমরা দেখতে পাই লিঙ্গধারণা সামাজিকভাবে নির্মিত এক অন্ধপ্রথা মাত্র—এই কথা বহুলমাত্রায় প্রচলিত হয়ে গেছে, এমনকি শিক্ষাব্যবস্থায়ও তোতাপাখির মত এই কথা কোমলমতিদেরকে আওড়াতে শেখানো হচ্ছে। আপেক্ষিকতাবাদ (Relativism) ও বিশৃঙ্খল স্বাধীনতার ধারণা ছাড়া আর কোনো শক্তপোক্ত দার্শনিক ভিত্তি এর পেছনে নেই। কিন্তু এই নব্য ধারণা কি আসলেই এমন কোনো পবিত্র রহস্য যাকে মানুষের হাজার হাজার বছরের সামষ্টিক অভিজ্ঞতার—অর্থাৎ, মানব শরীরি-গঠনতন্ত্রের (anatomy)—ওপর প্রাধান্য দিতে হবে?

ইসলাম মতে লিঙ্গ মানুষের পাশবিক বৃত্তি ও স্বর্গীয় প্রকৃতি উভয় থেকে উদ্ভূত। দ্বিলৈঙ্গিক মূলনীতি অর্থাৎ, নারী ও পুরুষের মিলনের উদ্দেশ্য কেবল সৃজনী ভালোবাসা তথা কেবল সন্তান উৎপাদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং নারী ও পুরুষের আপাত বিপরীত তবে পরিপূরক গুণ ও যোগ্যতার মাধ্যমে জগতের নির্মাণ